ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 2, June, 2024

দুই বাংলার নাটক : অন্তর্গত মিল

DR. Sanjoy Pal,
Assistant Professor, Department of Bengali
Alipurduar University, West Bengal, India.
Corresponding Author Email: snjapdu@gmail.com

ARTICLEINFO

শব্দসূচক : *পূর্ববঙ্গ, গণআন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট, গণনাট্য, ভাষা আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মুক্তিসংগ্রাম, প্রতিরোধ, লোকজ, গ্রুপথিয়েটার*

Received : 14, April
Revised : 04, June
Accepted: 08, June

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সার-সংক্ষেপ

অখণ্ড বাংলার নাট্যরচনার ও নাট্যভিনয়ের যে সাড়া বাঙালি সমাজে বহুকাল ধরে বহমান, স্বাধীনতা উত্তরকালে সীমান্তের বেড়া সেই উত্তরাধিকারকেই যে বিভক্ত করতে পারেনি সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয়। অভিজাত, অনভিজাত ও নিম্নবর্গের মানুষ সে-পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানসিকতায় নাটক লেখেন, প্রযোজনা করেন এবং তার অভিনয় দেখেন। হতে পারে ১৯৪৭ এর পর দুই বাংলায় সঙ্কটের চেহারা আপাতদৃষ্টিতে অনেকটাই আলাদা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কিংবা সমন্বয়ের ছবিটাও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ১৯৪৭ পরবর্তী কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গ এবং ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্বপাকিস্তান / বাংলাদেশ যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছে কিংবা নাটকে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্রের শাসন, অত্যাচার, স্বাধীনচিন্তার কণ্ঠরোধ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক স ঙ্কট ইত্যাদি দুই বাংলার নাট্যকারকেই সমানভাবে ভাবিয়েছে। আমাদের আলোচনায় এটাও উঠে আসবে। আমরা পশ্চিমবাংলার বেশকিছু গ্রুপথিয়েটারকে বাংলাদেশের নাট্যকারদের নাট্যাভিনয় যেমন করতে দেখেছি, তেমনি বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতেও দেখেছি। চেষ্টা করেছি সেগুলোর জনপ্রিয়তার কারণ খোঁজার। বাংলাদেশের জনজীবন, সংস্কৃতি কিংবা আর্থ-সমাজনীতি আমাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলেই কি তা সম্ভব হচ্ছে? এর বিচারও আমরা করবো। বিপরীতে বাংলাদেশও নাট্যচর্চায় গণনাট্যের উত্তরাধিকার এবং তথাকথিত নবনাট্যের অনুসরণ করার দিকটিও আমাদের বিচারের মধ্যে থাকবে। এছাড়াও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটক রচনায় দুই বাংলার নাট্যকারদের পারস্পরিক ঋণগ্রহণ কতটা তা আমরা খুঁজে দেখবো। অখণ্ড বাংলার লোকনাট্যচর্চা কিভাবে দুই বাংলার নাট্যকারদের আজও আকর্ষণ করে চলেছে তা যাত্রা, পাঁচালী ও নানাধরনের লোকনাট্যের নিরিখে আমরা বিচার করবো। নাট্যপ্রযোজনা, পরিবেশনার দিক থেকে দুই বাংলার নাট্যকারদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের কিছু তথ্য আমরা তুলে ধরবো।

১৯৪৭ এ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের নাট্য রচনার স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নিয়েছিল, যা ইতিহাসের দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার নাটকের উত্তরাধিকার, সে গণআন্দোলনমুখী নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক ইত্যাদি যে কোনো গোত্রের নাটকের ক্ষেত্রেই সত্য। ১৯৪৭-১৯৭১ পূর্ববাংলার গণআন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা তা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। যার উপরে লেখা আহমেদ সানির 'বাংলাদেশের নাটক : সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ (১৯৪৭-১৯৭০) প্রবন্ধটি আমার এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম এবং তার পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের তথ্যগত ও বিশ্লেষণগত রূপরেখার পটভূমি অবশ্যই সানি রচিত উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট। এই মুহূর্তে আমি ১৯৪৭-১৯৭০ কালপর্বের কয়েকটি নাটক স্মরণ করতে বাধ্য। সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১। সমাজজীবনের চিত্র:

শওকত ওসমান(১৯১৭–১৯৯৮)— 'তস্কর ও লস্কর', ' নুরুল মোমেন (১৯০৮–১৯৯০)--নেমেসিস'(১৯৪৪)

আসকার ইবনে সাইখ(১৯২৫–২০০৯)—'বিরোধ'(১৯৪১)

আলী মনসুর(১৯২৩–২০০২)—'পোড়োবাড়ি'(১৯৪৩)

আবদুল হক(১৯১৮–১৯৯৭)—'অদ্বিতীয়া'(১৯৫৬)

২। ইতিহাস নির্ভরতা:

শাহাদাৎ হোসেন(১৮৯৩–১৯৫৩)— 'মসনদের মোহ '(১৯৪৬) 'আনারকলি'(১৯৪৫)

ইব্রাহিম খাঁ(১৮৯৪–১৯৭৮)— 'কামালপাশা'

৩। ভাষা আন্দোলন :

মুনীর চৌধুরী(১৯২৫–১৯৭১)—'কবর'(১৯৫৩)

আসকার ইবনে সাইখ(১৯২৫–২০০৯)—'বিদ্রোহী পদ্মা'(১৯৪৮) 'দুরন্ত ঢেউ'(১৯৫১)

৪। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি :

মুনীর চৌধুরী১৯২৫–১৯৭১)—'মানুষ'(১৯৪৭)

৫। গণআন্দোলনের প্রভাব :

আসকার ইবনে সাইখ(১৯২৫–২০০৯)—'অনেক তারার হাতছানি'(১৯৫৭)

৬। ইংরেজ বিরোধী :

আকবর উদ্দিন(১৮৯৫–১৯৭৮)—'মুজাহিদ'(১৯৫৬)

সিকান্দার আবুজাফর(১৯১৯–১৯৭৫)—'সিরাজ-উদ-দৌল্লা,(১৯৬৫)

সাঈদ আহমেদ(১৮১৭–১৮৯৮)—'শেষ নবাব'(১৯৮২)

১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের লোকায়ত জীবনে নানা বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে

স্বাধীনোত্তর দুই বঙ্গেই মোটামুটিভাবে সমস্যাধর্মী নাটক রচনার মিল দেখা যায়। যেমন—

ক. স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আদর্শানুসারী গণনাট্যের উপর প্রবল আক্রমণ নেমে এসেছিল। তার কারণ গণনাট্যকাররা কৃষকের সঙ্গে মহাজন, জমিদার, জোতদার, ধর্মীয় গোঁড়ামি শিক্ষার প্রসার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক রচনার শক্তিশালী গতিমুখ না পেলেও পূর্ববাংলাতেও পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্যের প্রভাবজাত কমিউনিটি থিয়েটার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

খ. দাঙ্গা-বিরোধী নাটক পূর্বপাকিস্তানের মত পশ্চিমবাংলার একাধিক নাটকে পাওয়া যায়।

গ. পূর্বপাকিস্তানে স্বাধীনতা উত্তরকালে যে লোকায়ত প্রভাবের কথা বলেছি তা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাটকে যে ঘুরে ফিরে এসেছে তার প্রমাণ 'দেবীগর্জন'(১৯৬৬) নাটকটি। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র দুই বাংলার নাট্যকাররাই দেখিয়েছেন। যেমন- বিজন ভট্টচার্যের(১৯০৬–১৯৭৮) 'দেবীগর্জন'(১৯৬৬) ও মুনীর চৌধুরীর 'নষ্ট ছেলের নাটক' (১৯৫০)টি।

বাংলা নাটকের দুই গতিমুখ : অন্তরঙ্গে এক

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও পূর্ববঙ্গের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই এর চিত্র শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'(১৯৬২) নাটকটিতে মেলে। আবার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ -এ দু-দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও ১৯৭০ থেকে জরুরী অবস্থার পূর্বসূচনা মেলে বিজন ভট্টাচার্যের 'লাস ঘুইর্‌যা যাও'(১৯৭০) নাটকের মধ্যে। জরুরী অবস্থার সময় পশ্চিমবঙ্গে মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' এ যে স্পষ্ট রাজনৈতিক সঙ্কট ও তার উত্তরণের দিক নির্দেশ করে তেমনি ১৯৭১ এর বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের মুহূর্তে লেখা বেশ কিছু নাটক আমাদের সামনে এসে যায়। যেমন- সাঈদ আহমেদ-এর 'মাইলপোষ্ট'(১৯৬২-৬৪) নাটকটি।

১৯৪৭-১৯৭১ এই কালপর্বে বাংলাদেশে নামের ছত্রছায়ায় যে সকল নাটক রচিত হয়েছে তার অধিকাংশ নাটকেই আছে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল কথকতা। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় এই সময়ে বাঙালিজাতি বাংলার মুক্তিসংগ্রাম তথা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ষড়যন্ত্র, পাকিস্তানের সামরিক আইন, ৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাঙালিজাতির এই সংগ্রামমুখর জীবনের চিত্র তৎকালীন কালপর্বে রচিত নাটক গুলোতে বিদ্যমান।

আবার লোকনাট্যের শিল্পরীতি অনুসরণ করলেও এঁদের নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য হিসেবে জসীমউদ্দীন,(১৯০৩–১৯৭৬) ইব্রাহিম খাঁ,(১৮৯৪–১৯৭৮) সাঈদ আহমেদ(১৮১৭–১৮৯৮) প্রমুখ নাট্যকারের নাম করা যায়।

বাংলাদেশের নাট্যকাররা পশ্চিমবাংলার নাট্যকারদের মত পৌরাণিক নাটক না লিখলেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটকে পশ্চিমবাংলাকে ছাপিয়ে দিয়েছে। 'রক্তকরবী'(১৯২৬) 'নবান্ন'(১৯৪৪) 'ছেঁড়াতার'১৯৫০) শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষমাত্রা যোগ করেছে। পরবর্তীকালে আবার 'অচলায়তন'(১৯১২) 'তাসের দেশ'(১৯৩৩) 'মুক্তধারা(১৯২২)' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে সাংকেতিকতার মাধ্যমে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করেছে। ১৯৫২ সালেই প্রতিবাদী নাটক 'কবর' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন মুনীর চৌধুরী। যার প্রেক্ষাপট ছিল ভাষা আন্দোলন। বলাবাহুল্য মার্কিন নাট্যকারদের প্রভাব দুই বাংলার নাট্যকারদের মধ্যেই বর্তে ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী দুই বাংলায়, ৫০-এর দশকে শাসকশ্রেণীর ক্রূরদৃষ্টি নাট্যকারদের উপর যেমন পড়েছিল, তেমনি প্রযোজনার উপরেও তার ছাপ পড়েছিল। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে তৎকালীন কংগ্রেসি সরকার ২৬শে মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে। তার আগে থেকেই ব্যবসায়ী, ধনী ও জমিদারদের প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকার তাদের শ্রেণিস্বার্থের জন্যই গণনাট্যকে নিষিদ্ধ করেছিলেন । স্বাধীনতার

পর অত্যাচার আরো দ্বিগুণ হয়। ১৮৭৬ এর পর আবার নাট্যনিয়ন্ত্রণের কবলে পড়ে বাংলার নাটক। গণনাট্যসংঘ প্রযোজিত ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ৫৯ টি নাটকের অভিনয় তৎকালীন সরকার নিষিদ্ধ করেন। নাটকগুলি হল—

অহল্যা, অহল্যা উদ্ধার, অফিসার, আবাদ, উদয়াস্ত, কন্টক, ভূয়া স্বাধীনতা, ধরতি কি লাল, চাষার বারোমাসী, দলিল, পথ, ভাঙাবন্দর, পথিক, জবানবন্দী, নবান্ন, সংঘবদ্ধতা, গোরা, মাউন্টব্যাটেন কাব্য, নীচের তলার মানুষ, চার্জসীট, নাগপাশ, দুর্ভিক্ষের পাঁচালি, নাটক নয়, জনক, মালয়ের মুক্তিযুদ্ধ, কাঁচরাপাড়া, India Immortal, শহীদের ডাক, দিশাহারা, বিসর্জন, বিচার, Baila Pahos, চার অধ্যায়, সবপেয়েছির দেশ, নয়নপুর, যাদু কি কুরসী, রেল কা কণ্ঠস্বর, কাটোওয়ালা, We want Light, শুকসারী, মৃত্যু নাই, অতলান্তিক চুক্তি, হাসপাতাল, ডাক, মহেশ, মঞ্জিল, যুদ্ধ চাই না, ইতিবৃত্ত, Till the Day I Die, নীলদর্পণ, পদধ্বনি, অরুণোদয়ের পথে, Hang Over, ঢেউ, ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, আবর্ত, Lest you Forget, মহুয়া ।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ -এর মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি-বিরোধী সরকার রাজনৈতিক জীবনে নানা অত্যাচার সংঘটিত করে। পাকিস্তান সরকারের অপশাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পূর্বপাকিস্তানের উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় এদেশে বসবাসরত সর্বস্তরের জনগণ ক্রমেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় একটাই ধ্বনি। রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার বিরোধীতার ধ্বনি। সমগ্র দেশ উত্তাল হয়। শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই আসকার ইবনে সাইখ রচনা করেন 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটক। এছাড়াও ‘দুরন্ত ঢেউ’, ‘দুর্যোগ’, ‘আওয়াজ' প্রভৃতি নাটক তিনি রচনা করেন। তার মধ্যে 'দুরন্ত ঢেউ' নাটকে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে।

১৯৬২ তে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের উপর আবার প্রবল আক্রমণ নেমে আসে। ১৯৬২ এর ভারত- চীন সীমান্ত বিরোধ, ১৯৬৪ তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, ১৯৬৫-৬৬ -র তীব্র খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ তে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে একদিকে নকশালপন্থীদের উত্থান, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলার চক্রান্ত। ফলত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন, অথচ ১৯৬৯ -এ আবার যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ এবং সেই সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের যে চক্রান্ত সেটি নাট্যকারদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকে তুলে ধরতে সাহায্য করে।

দশ বছর যেতে না যেতেই 'West Bengal Dramatic Performance Bill' নামে একটি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিধি আবার এসে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। গেজেটে যে বিলগুলোতে আপত্তি জানানো হয়েছিল তা সর্বসমক্ষে এসে পড়লে দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া আবার দেখা দিতে থাকল। দৈনিক বসুমতী, স্বাধীনতা, লোকমত, দর্পণ, যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হল। দলমত নির্বিশেষে নাট্যানুরাগী মানুষরা যেমন- সাধনকুমার ভট্টাচার্য,(১৯১৫-১৯৭০) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়,(১৯০৪–১৯৯৩) বনফুল,(১৮৯৯-১৯৭৯) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,(১৮৯৮–১৯৭১) প্রেমেন্দ্র মিত্র,(১৯০৪–১৯৮৮) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,(১৮৮২–১৯৬৪)অরবিন্দ পোদ্দার,(১৯১৯–২০২১) অহীন্দ্র চৌধুরী, (১৮৯৬–১৯৭৪)নরেশ মিত্র,(১৮৮৮–১৯৬৮) সলিল সেন,(১৯২৪) তাপস সেন(১৯২৪–২০০৬) প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রতিবাদ জানালেন। নানা থিয়েটার গ্রুপের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়। নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিবাদ সভার সামান্য বিবরণ এ স্থলে তুলে ধরা যেতে পারে—

> “১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনে নাকি নাটকের কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল যা হালে রচিত হয়েছে তাকে কি বলা যায়? বলা যায় নাটকের মৃত্যবাণ .....” (বন্দ্যোপাধ্যায়,৯৪)

—সেই সময়ে তৎকালীন কংগ্রেসি সরকারের রোষানলে পড়ে উৎপল দত্তের (১৯২৯–১৯৯৩)'কল্লোল'(১৯৬৫) নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সমস্ত বাঁধা দূর করেই ‘কল্লোল’ হৈ হৈ করে চলতে থাকে। উৎপল দত্ত ছাড়াও জোছন ঘোষ দস্তিদারেরও(১৯৩১–১৯৯৮) বহু নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে ছ'য়ের দশকে। সাতের দশকের মুক্তি যুদ্ধের সাফল্য ও বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের প্রেক্ষাপট ছয়ের দশকে নানা নাটক রচনা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বীজ রোপণ করে। বরিশাল, রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। পশ্চিমবাংলার মত সাবেক পূর্ববাংলার ছ'য়ের দশকে নবনাট্য সংঘের একটা ভূমিকা আমরা দেখি চট্টগ্রামে। সাতের দশকে তা প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ উত্তর বাংলাদেশের নাট্যজগতে অনেক জ্যোতিষ্ক উপস্থিত হন। ১৯৬৯-এ বরিশালে শিল্পীসংসদের গোড়াপত্তন অবশ্যই ছ'য়ের দশকের নাট্যকারদের প্রবলভাবে উত্তেজিত করে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝাউতলা নিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত ১৯৬৪ তে পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বে অনেক নাটক অভিনয় করেন। ১৯৬৯ -এ গণ অভ্যুত্থানের সূচনাকালে বরিশালের 'খেয়ালী' গ্রুপথিয়েটার জন্ম নেয় এবং পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।

একইভাবে রাজশাহীর নামও আমাদের মনে রাখতে হয়, মনে রাখতে হয় নাট্য আন্দোলনের ছয়ের দশকের রং পুরের নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপট। ১৯৫৮ -এ পূর্বপাকিস্তানে 'মার্শাল ল' জারি হবার পর নাট্যসমাজ জেগে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের লেখা যেমন, ধনঞ্জয় বৈরাগীর -'রূপালী চাঁদ'(১৯৫৮), কিরণ মৈত্রর -'বারোঘন্টা'(১৯৫৮), রবীন্দ্র মোহন মৈত্রর 'মানময়ী গার্লস স্কুল',নিশিকান্ত বসু রায়ের 'পথের শেষে',নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' প্রভৃতি নাটক রংপুরে অভিনীত হয়। আরো আগে শরৎচন্দ্রের(১৮৭৬–১৯৭৮) উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দিতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের নাট্যকাররা। একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ছ'য়ের দশকে পশ্চিম ও পূর্ববাংলায় ব্রিটিশের নাট্যনিয়ন্ত্রণ কালোবিলের নতুন করে প্রয়োগ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২-১৯৬৩ তে নতুন আইন জারি করে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা শুরু হয়।

বাংলাদেশেও একইভাবে দেখা যায় যে, ষাটের দশকে পূর্ববাংলার অগণতান্ত্রিক সরকার নাটক অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাবের ফলে নাট্যসমাজের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসে ঘনঘটা। ডি আই বি'র ওয়াচ শুরু হয়ে যায়। পুলিশের আক্রমণের হাত থেকে কোনো নাটকই রেহাই পায় না। ১৯৬২ তেই টাউন হলের প্রেসিডেন্ট অসাংবিধানিক উপায়ে নাট্যসমাজকে উৎখাত করে ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে। ১৮৮৫ সালে যে নাট্যরচনা শুরু হয় একটানা ৭৭ বছর চলার পর তার যবনিকা পড়ে ।

৭০ এর দশক : দুই বাংলার নাটক

পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসি সরকার জোট বেঁধে ৭০ -এর দশকে প্রগতিশীল আন্দোলন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ওপরও অত্যাচার চালায়। তৎকালীন সময়ের 'গণনাট্য' পত্রিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে—

এক. "বরাহনগর শাখার কানাই গাঙ্গুলী ও অসিত দাস দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট গুণ্ডা ও নকশাল সমাজবিরোধীদের দ্বারা গুরুতরভাবে আহত হন। দেশবন্ধুনগর শাখার গৌর সেন, লোকমঞ্চ শাখার কৃষ্ণদাস ঘোষ ও শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির উপর নকশালপন্থীরা হামলা চালায়। শিল্পীচক্র শাখার নির্মল মজুমদারকে মিথ্যা মামলায় জড়ান হয়। প্রতিচ্ছবি শাখার অসীম দাসকে নকশালপন্থীরা গুম করার চেষ্টা করে।

কলিকাতা জেলার উত্তর বেলেঘাটা, বদরতলা ও জোড়াবাগান শাখার মহড়া কক্ষের উপর প্রতিক্রিয়ার অনুচরেরা বারবার আক্রমণ চালায়।" (গণনাট্য)

দুই. "চমকে উঠতে হল তখনি, যখন শুনলাম সেখানে গণনাট্যের গরীব অন্ধ গায়ক আশু মুখার্জি তাঁর একতারাটি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন – এবং তাঁকেও নির্মম প্রহারের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে/..... কিছুদিন আগে গণনাট্যের ভূতপূর্ব সভাপতি কালীবিলাস

ভট্টাচার্যও আক্রান্ত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, ...কমরেড মুখার্জি মিছিলের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন থানার একপ্রান্তে, জনৈক পুলিস কর্মচারী তাঁকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে সি.আর.পি.-র হাতে অর্পণ করে বলেন—

এ মিছিলে গান গায় আর বিশৃঙ্খলা আনে।

সুতরাং তাঁকে যে গান গাওয়ার অপরাধেই ধরা এবং মারা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এখন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভগ্নদশা একতারা লিখবার সময় পর্যন্ত থানায় জমা আছে পুলিসের হেপাজতে। মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম—

আপনাকে কি খুব মারধর করা হয়েছে?'

উত্তরে তিনি বাঁ হাতের কনুইটা দেখিয়ে বললেন

এইখানটায়ই বড্ড বেশী মেরেছে, ভেঙে যেত, তবে এর চেয়ে বেশী চোট খেয়েছে আমার একতারাটি, সেটি বোধহয় ভেঙ্গেই গেছে।

তাঁর মুখ দেখে মনে হল তাঁর আঘাতের চেয়ে একতারার উপর আঘাতটাই বড় করে বেজেছে। এই ক্ষীণদেহ অন্ধ গায়কের বিরুদ্ধে পুলিস কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ যে অভিযোগ এনে মামলা করেছেন তা হচ্ছে 'attempt to murder' অর্থাৎ এই অন্ধ হাতড়ে আর হাতড়ে হত্যা করার জন্য মানুষের কলজের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল।

ভাবছি এ মোকদ্দমা কবে কোর্টে উঠবে কারণ এ মোকদ্দমার নূতন মনোভাবোচিত রায়দানের জন্য আবার একজন অন্ধ বিচারপতির আবশ্যক তো!" (গণনাট্য)

তিন. "২১ অক্টোবর চুঁচুড়ার আঞ্চলিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে কোতরাং নাট্যচক্র শাখার 'হচ্ছেটা কি' নাটকটি স্থানীয় পুলিশ বন্ধ করে দেয়। শিল্পায়ন নাট্যসংস্থা দুর্গাপুরের একটি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় 'হারাধনের দশটি ছেলে' নাটক করার সময় একদল যুবক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পীদের উপর হামলা করে এবং রমেন দাসকে হলের বাহিরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। শিল্পায়নের শিল্পী ও দর্শকদের প্রতিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত কোনো শোচনীয় পরিণতি ঘটেনি। গত নভেম্বর মাসে মালদহ শাখার 'গম্ভীরা' গানের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার জন্য সমাজবিরোধীরা হামলা করে কিন্তু জনসাধারণের দৃঢ় প্রতিরোধে তারা ব্যর্থ।" (গণনাট্য)

চার. "গত সংখ্যায় ১৯ ও ২০ এপ্রিল পাণ্ডুয়া শাখায় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠান যাত্রাভিনয়ের ওপর পুলিস ও আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আঘাত সম্পর্কে আমরা পাঠকদের জানিয়েছি। আমরা আরও জানতে পারলাম ১৭ এপ্রিল এ বিষয়ে পাণ্ডুয়া থানায় একটি আবেদন করা হয়েছিল। যদিও মফঃস্বলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পূর্বাহ্নে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সর্বদা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পুলিশ এক্ষেত্রে ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত না করে ১৯ এপ্রিল একটি চিঠি দিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেয়। পুলিশের অনুমতি দেওয়া হয়নি এই অজুহাত দেখিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দর্শক ও স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় করা গেলেও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। যে কোন অজুহাতে প্রগতিশীল ন্যাটানুষ্ঠানের ওপর কর্তৃপক্ষ শ্রেণীগুলির এই হামলা অবশ্যই কোন প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়।

শুধু গণনাট্য সংঘ নয়, যে কোন প্রগতিশীল সংগঠনই আজ এই ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে। 'ইউনিট থিয়েটার' কর্মীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার পর একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ মে ভারতবন্ধের দিন 'মৌসুমী গোষ্ঠীর কর্মী শংকর কর্মকার ও সলিল চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। পুলিসের

> সামনেই গুণ্ডাবাহিনী উক্ত দুজন সংস্কৃতিকর্মীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে গুরুতর অবস্থায় আর.জি.কর হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য করে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিয় নন্দীকে রেলধর্মঘটের সময় পুলিস গ্রেপ্তার করে একদিন আটকে রাখে। শান্তিপুরের পাক্ষিক সংবাদপত্র জনতার মুখ গত ২৩ জুন আবার স্থানীয় যুব কংগ্রেসি বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে। ঐদিন বিকেলে শান্তিপুরের কালী মুখার্জীর মাঠে পঃ বঃ বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের ৭ম বার্ষিক জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের স্থানে তারা জনতার মুখ -এর ২০ জুন প্রকাশিত সংখ্যাটির কিছু কপি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। উক্ত যুব কংগ্রেসিরা "জনতার মুখ জ্বলছে জ্বলবে" "জনতার মুখ প্রকাশ করতে দেব না" ইত্যাদি শ্লোগান দেয় এবং মিছিল ও পথসভায় সংবাদপত্রটির ছাপাখানার কর্মী ও সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সাংবাদিক ও পাঠকদের শাসায়। এক্ষেত্রেও পুলিস কোন হস্তক্ষেপ না করায় সংস্কৃতি আন্দোলনকে শাসকশ্রেণী যে কিরকম ভয় পেতে শুরু করেছে উপরের ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ বহন করে। এ বিষয়ে গণতান্ত্রিক মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনাকে লাগাতার প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত করে তোলাই হবে গণনাট্য কর্মীদের এই মুহূর্তের কাজ।" (গণনাট্য)

৭০-এর দশকেই উৎপল দত্তের(১৯২৯–১৯৯৩) অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক 'টিনের তলোয়ার'(১৯৭১)এর অভিনয় বন্ধ করার হুকুম জারি হয়। ১৯৭৪-এ 'দুঃস্বপ্নের নগরী'(১৯৭৪) নাটকটিরও অভিনয় জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় লাঞ্ছিতও হন উৎপল দত্ত ও তাপস সেনের মতো নাট্যকারেরা। এ ছাড়াও চিররঞ্জন দাসের(১৮৭০–১৯২৫) 'সন্ত্রাস' ও 'কাম্বোডিয়া', বাসুদেব বসুর 'কিমলিস' নাটককেও সমাজবিরোধীরা অভিনীত হতে দেয় না। 'রূপান্তরী'র 'অমর ভিয়েতনাম' নাটক প্রযোজনাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বহু গণনাট্য কর্মীকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পরই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরাধীন জাতি স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য তৈরি করতে পারলেও নাটক রচনা ও অভিনয় করতে পারে না। এ কথা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। ব্রিটিশ আমলেও ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা হত। বাঙালি নাট্যকাররা ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই নাটক রচনা করেছেন। বাংলাদেশের মাটিতেও পাকিস্তানি সরকার থাকার সময়ও সে চাপ যথেষ্ঠ পরিমাণেই ছিল। মুনীর চৌধুরী, ওয়ালীউল্লাহর(১৯২২–১৯৭১)রচনার মধ্যেও সুপ্ত বিদ্রোহ ছিল। যা সময়ের অভাবে পূর্ণতা পায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক নাট্যকাররাই তাঁদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। মঞ্চভাবনা, প্রয়োগ প্রভৃতিতেও বাংলাদেশ এক বিশিষ্ট নাট্যধারা গড়ে তুলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে বসেও অনেক নাট্যকার ভালো ভালো নাটক উপহার দিয়েছেন। যদিও সময়টা সুখকর ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি ঘাতকদের অন্যতম শিকার ছিলেন নাট্যকাররা। সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১-১৯৭৫ সলের মধ্যে ৫০-এর বেশি নাটক তাঁরা রচনা করেছেন। যেমন – মমতাজউদ্দীন(১৯৩৫–২০১৯)-এর 'বিবাহ' ও 'কী চাহ শঙ্খচিল'(১৯৮৫) তাঁর মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ নাটক। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> "স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে কী চাহ শঙ্খচিলের বিষয় নির্ধারিত। বিবাহ নাটকের সখিন এবং কী চাহ শঙ্খচিলের রৌশনআরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার এবং একাত্তরের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত তেমনি বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ।" (আহমেদ)

পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নারীধর্ষণের কলঙ্কিত বিষয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত হয়েছে কী চাহ শঙ্খচিল' নাটকটি । নিজে নারী হবার সুবাদে, নারীর ভেতরকার বুকফাটা আর্তনাদ শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় নাটকের নায়িকা চরিত্র রৌশনআরার সংলাপে—

> "যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর আমি তো প্রতিবাদ করিনি - আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?.. স্বাধীনতা ? কার স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা? মায়ের কোলে বাচ্চা নাই, মানুষের চোখে নিদ নাই, নদীর বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা? তোমার মাথার উপর থাইক্কা উড়াজাহাজের মতোন জল্লাদ পাখি তাড়াইতে পারবা, তোমরা বইনের মুখ থাইক্কা লাঞ্ছনা মুছতে পারবা? আমার মাথার আগুন নিভাইতে পারবা।" (পূর্বোক্ত,৭১)

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী ধর্ষণের পটভূমিকায় লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে আলাউদ্দীন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা" (১৯৭২), 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭৪) জিয়া হায়দারের 'সাদা গোলাপে আগুন' (১৯৮২) | কিন্তু সবথেকে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক। তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) কাব্যনাটকে পালাবদলের ইতিহাস আমরা খুঁজে পায়। নাটকের সমাপ্তিতে পাইক প্রতিশোধের বাণী উচ্চারণ করেছে—

"এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন

দেখাইয়া দেই সব কোথায় কখন

কী গজব কী আজাবে ছিল লোকজন

জালেমের হাতে ছিল শাসন

শত শত মারা গেছে আত্মীয় স্বজন।

এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন

দেখাইয়া দেই সব কী ভাবে কখন

মেলেটারি ঘাঁটি নিয়া ছিল কয়জন

কারা কারা সঙ্গে ছিল তাদের তখন

অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন

জলদি জলদি সব চলেন এখন।" (হক,৫৫)

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটকেও দুই বঙ্গের অপূর্ব মিল লক্ষ করা যায়। এপার বাংলায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' কে প্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধর নাটকের মধ্যে ধরা যায়। বাংলাদেশে এ ধারায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। তিনিও মার্কসের শ্রেণিচেতনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই বলতে পেরেছিলেন—

> "ভাঙনের মুখে সুরমা নগর, সমৃদ্ধ জনপদ, বড় বড় সভ্যতা কিছুই টেকে না, কিন্তু টিকে থাকে মানুষ, তার সংগ্রাম, সর্বোপরি শ্রেণি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস।" (রশীদ)

এই বিশ্বাস থেকেই শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে নাটক লিখে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে তুলে ধরেছেন। এ দিক থেকে তিনি বাংলাদেশের নাট্যধারায় এক বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর লেখা নাটকগুলোর মধ্যে—'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ইবলিশ' (১৯৮২), 'এখানে নোঙর' (১৯৮৪), 'গিনিপিগ' (১৯৮৬), উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবাদ ও নিজেদের অধিকারকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করছে তারা, তা কয়েকটি নাটকের সংলাপ অল্পবিস্তর তুলে ধরলে পরিষ্কার হবে।

'এখানে নোঙর' নাটকে সফুরা বলেছে—

> "আমি যাই-এই চড়ায় আবার আবাদ অইবো - সোনার ফসল অইবো – কোনো এক ফসল তোলার দিনে আমি ফিরা আসুম, ততদিন তোমরা একলগে থাইকো - কও তোমরা আর চেয়ারম্যানের কতা হুনবা না"..... (রশীদ,৭১)

'ওরা কদম আলী' নাটকে সর্দার বলেছে—

> "আজই থিকা এই ঘাটে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেইলা কাম করুম আর আমাগো ইজ্জতের উপর হামলা অইলে জান দিয়া রুখমু।" (রশীদ,৮১)

'ওরা আছে বলেই' নাটকে কাওছারের জীবন্ত সংলাপ—

> "আমাগো তো সবই গেছে আর কী-ইবা যাইবো। এইবার ওগো শেষ করুম। হেরপর যদি আমরাও শেষ হই-কোনো দুঃখ থাকবে না।" (রশীদ,৬৭)

বাংলা নাটকে লোকজ উপাদানের ব্যবহার :

এপার বংলার বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন'(১৯৬৬) মনোজ মিত্রের(১৯৩৮) 'শিবের অসাধ্যি'(১৯৭৪) অরুণ মুখোপাধ্যায়ের(১৯৩৭) 'রামযাত্রা' প্রভৃতি নাটকে লোকজ উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাটকেও লোকজ উপাদান ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। লোকনাট্যের মূল উপাদান নৃত্য ও গানের সার্থক ব্যবহার ঘটেছে এই পর্বের নাটকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকজবিশ্বাস এবং লোকউপাদান বাংলাদেশের নাটকে নতুন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য, পালাগান, কৃষ্ণলীলা, জারিগান, কবির লড়াই, পুতুল নাচ প্রভৃতি থেকে নাট্যকাররা অনুপ্রেরণা লাভ করেন। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ, মমতাজউদ্দীন আহমদ, মান্নান হীরা প্রমুখ নাট্যকাররা এই ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের(১৯৩৫–২০১৬) 'নূরলদীনের সারাজীবন'(১৯৮২) সেলিম আল দীনের (১৯৪৯–২০০৮)'কিত্তন খেলা'(১৯৮৬) প্রভৃতি নাটকে বাঙালির লোকজীবনের নানা ছবি সুপরিস্ফুট।

দেশের অগণিত নিরক্ষর মানুষের জীবনবোধকে আশ্রয় করে লোকসংস্কৃতির উপাদান গড়ে ওঠে। কিছু কিছু আগের অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা হয়েছে। রূপকথা, উপকথা, জাদু, ছড়া, এ ছাড়া নানা উৎসবের গানগুলোও এই ধারায় পড়ে। তবে লোকসংস্কৃতি যে স্থায়ী তা নয়। কালের বিবর্তনে সেগুলোরও রূপান্তর ঘটে। কিন্তু অবিনশ্বর ধ্রুপদী সৃষ্টিতে যে লোকজ উপাদান একবার স্থান পায়। সেই পুরোনো দিনের কথা বহু বছর বহু দিন ধরে জীবিত থাকে নানা সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে। আমরা আগেও কিছু নাট্যকারের নাম করেছি এখানেও করবো। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের(১৯০৩–১৯৭৬) 'বেদের মেয়ে'(১৯৫১) 'পদ্মাপার'(১৯৫০) 'পল্লীবধূ'(১৯৫৬) আজিমউদ্দীনের(১৯৩৩–২০২২) 'মহুয়া' এবং 'কাঞ্চন' এবং 'মাধবমালঞ্চী কইন্যা'(১৯৬০) নাটকগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের উপর ভিত্তি করে সেলিম আল দীনের 'চাকা'(১৯৯১) নাটকটিও লোকজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের মতই বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পথনাটকের উদ্ভব হয়। বাংলাদেশের নাট্যধারায় উল্লেখযোগ্য পথ নাটকগুলো হল আল মামুনের 'তিনটি পথনাটক' (১৯৯১) 'আন্দু ও অভিষেক' (১৯৯১), নাসিরউদ্দীন ইউসুফের 'একাত্তরের পালা' (১৯৯০), মান্নান হীরার 'মৃগনাভি' (১৯৯১), 'শেকল' (১৯৯১), আদাব' (১৯৯১), 'ঘুমের মানুষ' (১৯৯২) প্রভৃতি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সে দেশের নাটকের উপর কোনো বড় ধরণের আক্রমণ আমরা দেখতে

পায়নি। যেমনটা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ শাসনের সময়কেও হার মানিয়ে ছিল কংগ্রেসিদের অত্যাচার। স্বাধীন বাংলাদেশে গত দুই দশকে শ্রেণি যুদ্ধের যে নাটক নাট্যকাররা লিখেছিলেন সেগুলো মৌলিক নাট্যসৃষ্টির তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ। কোনো জাতি এত কম সময়ে এত পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা এগুলো থেকে প্রমাণ হয়। কিন্তু তার মানে যে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার জোয়ার এসে গেছে এ কথা বলা যায় না । তবে একথা অবশ্যই বলা যায় ১৯৭২-১৯৮৩ এই এগার বছর বাংলাদেশের নাটকে অগ্রগতি হয়েছে। নাট্যদলের সংখ্যায় যেমন, তেমনি প্রযোজনাতেও।

স্বাধীন বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গের মতই বহু গ্রুপথিয়েটার গোষ্ঠী নিয়মিত নাটক করে যাচ্ছেন। রাজধানী ঢাকার, গোটা আষ্টেক দল নিয়মিত অভিনয় করে যাচ্ছেন। এঁরা হলেন নাগরিক থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার ,আরণ্যক, ড্রামা সার্কেল, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী ও নাট্যচক্র।

বহু ভালোনাটক অভিনয় করে নাগরিক বাংলাদেশের প্রথম সারির নাট্যদল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'নূরলদীনের সারাজীবন'। সুপ্রকাশ রায়ের ‘ভারতের কৃষক বিদ্রাহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় শামসুল হক নাটকটি ১৯৮১ তে লেখেন। দুর্দান্ত বিদ্রোহী কৃষক নূরলদীনের সারাজীবনের দেশপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান—

> “পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় করিয়া ঘৃণ্যষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুইটি প্রদেশ—বাংলা ও বিহার অধিকার করিয়া বসে/..... প্রাচীন গ্রামসমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের অনন্ত শূন্যতার মধ্যে পরাজিত ও পদদলিত ভারতবাসী - ভারতের কৃষক-শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অসহনীয় শোষণ ও যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া উঠে। অনিবার্য ধ্বংস, অথবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দ্বারা ইহার উচ্ছেদ সাধন। ভারতের কৃষক দ্বিতীয়টিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিল। অবর্ণনীয় শোষণ উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হইল ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের রংপুর বিদ্রোহ। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ সকলে সমবেত ভাবে নূরল উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের পরিচালক নির্বাচিত করিয়া তাহাকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল।” (গ্রুপ থিয়েটার, ৫২৩)

থিয়েটার মধ্যবিত্তর জীবনবোধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই কাজ করেছে। তাঁদের প্রযোজিত নাটকে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন-আল মামুনের (১৯৪২–২০০৮)'এখন ক্রীতদাস'(১৯৮৩), কোকিলারা'(১৯৯০),’মেরাজ’(১৯৯৭) ফকিরের মা', নাটকে এই ছবি মেলে। রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১–১৯৪১), মার্লো(১৫৬৪–১৫৯৩), প্রফুল্ল রায়(১৯৩৪) এঁদের উপন্যাস নিয়ে কাজ করে মধ্যবিত্তের জীবনকেই তুলে ধরেছে।

আরণ্যক নাট্যসম্প্রদায় শ্রেণি সংগ্রামের কথা ও অধিকারহীন মানুষের কথাই বেশি বলেছে। তাঁদের নাটকে রাজনৈতিক বিশ্বাস, স্পষ্ট প্রতিফলিত। মামুনুর রশিদের (১৯৪৮) 'ওরা কদম আলী'(১৯৭৬),'ইবলিশ'(১৯৮৩), 'এখানে নোঙর'(১৯৮৪), ’পাথ’ (১৯৯৩), ‘প্রাকৃতজন কথা” তে সেই ছবিই ফুটে উঠেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গেও এই গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠী যথেষ্ঠ প্রসার লাভ করেছে। বামপন্থী আদর্শ থেকে খানিকটা সরে এসে আপাদ মস্তক এই মধ্যবিত্তের থিয়েটারগুলো এখনো নানা নাটক অভিনয় করে যাচ্ছেন। গণনাট্যের সম্পূর্ণ বিরোধী এই থিয়েটারে সুবিধা বা দরকার মত মানুষের প্রতিবাদকে তুলে ধরার চেষ্টা আজও লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্ল রায় প্রমুখদের উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিবঙ্গেও বাংলাদেশের লেখকদের কালজয়ী উপন্যাসেরও সার্থক নাট্যরূপ নিয়মিত হয়ে চলেছে। মনোজ মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি নাট্যকাররা তাঁদের পরিচালিত থিয়েটার গোষ্ঠীকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছেন। কখনো সামাজিক নাটক, কখনো বিভিন্ন

কালজয়ী উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন। সমান্তরালে বাংলাদেশেও একই রকম ভাবে মৌলিক নাটক রচনা হয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গেরই মতই জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষ সারা দেশ জুড়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। তাই এ প্রবন্ধেও সে সম্পর্ক কিছু না বললে অকৃতজ্ঞ মনে হবে। আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুই বাংলার-ই কবি, সাহিত্যিক বা মনীষী। এপার বাংলায় শ্রী শম্ভু মিত্র(১৯২৫–১৯৯৭) রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনাতে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। বাংলাদেশের নাট্যকাররা এবং প্রযোজকরা রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে নিজস্ব ভাবনা ও বিশ্লেষণ যোগ করেছেন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ উচ্চারণে খামতি থেকে যাচ্ছে। অতিসতর্কতার মধ্যেও যেন স্থানচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তবুও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আমাদের সমাদর করতেই হয়। এ বঙ্গের মতোই নিয়মিত এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাটক হয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র :

গণনাট্য, জানুয়ারী, ১৯৭১

গণনাট্য, সম্পাদকীয়, জুলাই, ১৯৭১

গণনাট্য, জানুয়ারী, ১৯৭৪

গণনাট্য, মে, ১৯৭৪

গ্রুপ থিয়েটার, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা - অগাস্ট-অক্টোবর - ১৯৮৩, পৃ. ৫২৩

পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

মমতাজউদ্দীন আহমেদ, বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) দ্র. ভূমিকাংশ

মামুনুর রশীদ, এখানে নোঙর (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪), দ্র. ভূমিকাংশ

মামুনুর রশীদ, এখানে নোঙর, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং- ১১, পৃ. ৭১

মামুনুর রশীদ, ওরা কদম আলী (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৮), পৃ. ৮১

মামুনুর রশীদ, ওরা আছে বলেই (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮০), পৃ. ৬৭

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও বাংলা নাটকের একশ বছর, মে, ১৯৯৫, পৃ. ৯৪

সৈয়দ শামসুল হক, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, কাব্যনাট্য সংগ্রহ (ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯১), পৃ. ৫৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

জিয়া হালদার 'বাংলাদেশের সমকালীন নাটক, সমকালীন বাংলা সাহিত্য'

দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারের ইতিহাস'

নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'বাংলাদেশের থিয়েটার'

বকুল আশরফ 'মুক্ত নাটক, আন্দোলন : বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা'

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথ নাটকের কথা'

রামেন্দু মজুমদার, "বিষয় : নাটক'

শিশির কুমার বসাক, 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস'

সুকুমার বিশ্বাস, 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা'

সৈয়দ শামসুল হক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'

সেলিম আল দীন 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য'